পরিস্থিতিতে ভারতে শিল্প বিরোধ ভবিষ্যতে আরো গভীর হয়ে উঠবে বলে অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন।

● **১২.২.৪. শিল্প শ্রমিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা ঃ সংজ্ঞা ও প্রয়োজনীয়তা (Social Security Measures for Industrial Labour : Definition and Necessity) ঃ** সামাজিক নিরাপত্তা হল সমাজের ব্যক্তিদের বিপদ, দুর্ঘটনা প্রভৃতি ঝুঁকি থেকে রক্ষা করার জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ। সাধারণভাবে সমাজ কর্তৃক যে সমস্ত ব্যবস্থা ও আচরণবিধি শ্রমিককে দায় ও দুরবস্থার হাত থেকে রক্ষা করে,

Scanned with CamScanner

শ্রমিকের জীবনকে সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তুলে শ্রমিকের বহুমুখী মঙ্গল সাধন করে সেই সমস্ত ব্যবস্থাকে সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা (Social Security Measures) বলে।

আধুনিক শিল্প উন্নয়ন নানাভাবে সমাজের অগ্রগতি ঘটিয়েছে এবং শিল্প শ্রমিকদেরও নানাদিক দিয়ে উপকৃত করেছে। কিন্তু এই শিল্প উন্নয়ন আবার সৃষ্টি করেছে শ্রমিকের জীবনে নানাধরনের অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা ও অসহায় বোধ। তাই আইনের মাধ্যমে শুধুমাত্র মজুরি হার নির্ধারণ করে শ্রমিককে তার ভবিষ্যৎ জীবনের অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা ও অসহায় অবস্থা থেকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা থেকে শ্রমিককে রক্ষা করতে না পারলে শ্রমিকের সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ ও শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধিতে শ্রমিকের আন্তরিক সহযোগিতা অর্জন করা সম্ভব হবে না। যে কোনো সময় শ্রমিক অসুস্থ হতে পারে, যে কোনো সময় কারখানায় তার দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, যে কোনো সময় সে বেঁচেই হতে পারে। তাই শিল্পে কর্মরত শ্রমিককে নানা ঝুঁকি নিয়েই উৎপাদনে অংশগ্রহণ করতে হয়। কর্মস্থলে শ্রমিকের জীবনে যেমন থাকে নানা বিপত্তি তেমনি যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশে তাকে বেঁচে থাকতে হয় সেটি কঠোর ও প্রতিকূল। এই ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থায় শ্রমিককে সাহায্য করা শুধু মানবতার দিক দিয়েই যে কাম্য তাই নয় শিল্প উৎপাদন তথা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থেও কাম্য। প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকের জীবনে যে সমস্ত ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা আছে তা দূর করার মতো প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করা ব্যক্তিগত শ্রমিকের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। শিল্প সমাজের প্রাচুর্য সত্ত্বেও যে অভাব, অনটন শ্রমিককে নিঃশেষ করে দিতে চায় তার বিরুদ্ধে শ্রমিককে আত্মরক্ষার শক্তি ও সামর্থ্য যোগাতে এগিয়ে আসতে হয় সরকার তথা সমাজকে। তাই সহায়সম্বলহীন শ্রমিকদের দিক বিবেচনা করে সরকারের সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

প্রকৃত অর্থে সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা শিল্প বিরোধের সম্ভাবনা হ্রাস করে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক উন্নত করে, শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধিতে শুধু সাহায্যই করে না গণতান্ত্রিক কল্যাণকামী রাষ্ট্রের ভিত সুদৃঢ় করে। যে সমস্ত দেশ যত বেশি উন্নত সেই সমস্ত দেশের সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাও তত উন্নত। তাই উন্নত দেশসমূহে যে শ্রমনীতি প্রবর্তন করা হয় তার মূল ভিত্তি হল শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা।

❖ **১২.২.৪.১. ভারতের শিল্প শ্রমিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা (Social Security Measures for Industrial Labour in India) :** সমাজ কর্তৃক যে সমস্ত ব্যবস্থা ও আচরণবিধি শ্রমিকদের দায় ও দুরবস্থার হাত থেকে রক্ষা করে শ্রমিকের জীবনকে সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তুলে শ্রমিকের বহুমুখী মঙ্গল সাধন করে সেই সমস্ত ব্যবস্থাকে শ্রমিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা বলে।

সম্প্রতি ভারতে কিছু কিছু সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। স্বাধীনতার পর ভারতে যে সমস্ত সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

(১) কর্মচারী রাজ্যবীমা আইন, 1948 (The Employees State Insurance Act 1948 : E.S.I.)

1948 সালের কর্মচারী রাজ্যবীমা আইনে যে বীমা ব্যবস্থা করা হয়েছে সেটি ভারতে সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা প্রবর্তনের পথে একটি বিশেষ পদক্ষেপ। এই আইনে যে সমস্ত শক্তিচালিত স্থায়ী কারখানায় দশ জন বা তার অধিক শ্রমিক এবং যে সমস্ত শক্তি ছাড়া স্থায়ী কারখানায় 20 জন বা তার অধিক শ্রমিক কাজ করে সেই সমস্ত কারখানার ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য হলেও সরকার প্রয়োজন মনে করলে যে কোনো শিল্প, বাণিজ্য বা কৃষি প্রতিষ্ঠানেও এই বীমা সম্প্রসারণ হতে পারে। প্রথমে মাসিক 500 টাকার নীচে যে সমস্ত শ্রমিক/করণিক মজুরি/বেতন পেত তারাই এই বীমার সুযোগ গ্রহণ করতে পারতো। সম্প্রতি 2004 সালের এপ্রিল মাস থেকে যে সমস্ত শ্রমিক/কর্মচারীর মজুরি/বেতন মাসিক 7500 টাকার কম তারা এই বীমার সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে বলে ঘোষণা করা হয়।

এই বীমা পরিকল্পনা পরিচালনা করার জন্য 40 জন সদস্যযুক্ত স্বাধীন কর্মচারী রাজ্যবীমা বা কর্পোরেশন (Employee's State Insurance Corporation) নামে একটি সংস্থার উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, মালিক, শ্রমিক ও চিকিৎসক প্রতিনিধি নিয়ে এই কর্পোরেশন গঠন করা হয়েছে। কর্মচারী রাজ্যবীমা পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তার জন্য একটি কর্মচারী রাজ্যবীমা তহবিল (The Employee's State Insurance Fund) স্থাপন করা হয়। শ্রমিক কর্মচারীদের চাঁদার মাধ্যমে এই তহবিল গঠন করা হয়। এছাড়া এই বীমা পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার অর্থ সাহায্য প্রদান করে এবং এই প্রকল্পের চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যয়ের 12·5 শতাংশ রাজ্য সরকার প্রদান করে থাকে।

Scanned with CamScanner

এই আইনে শ্রমিক কর্মচারীদের পাঁচ ধরনের সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়।

(ক) **অসুস্থ অবস্থায় সাহায্য (Sickness Benefit) ঃ** অসুস্থ অবস্থায় বীমাকারী শ্রমিক/কর্মচারী নিরবচ্ছিন্ন এক বৎসরে সর্বোচ্চ 91 দিনের অসুস্থতার জন্য অর্ধেক মজুরির হারে অর্থ সাহায্য পায়। সাহায্যপ্রাপ্ত শ্রমিক কর্মচারীকে অতি অবশ্যই কর্পোরেশন দ্বারা পরিচালিত বা কর্পোরেশন দ্বারা নির্দিষ্ট চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে (Medical Institution) চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে হয়। বীমাকারী শ্রমিক কমপক্ষে 9 মাস চাঁদা দিলেই এই সাহায্য পায়।

(খ) **চিকিৎসার সুবিধা (Medical Benefit) ঃ** বীমাকারী শ্রমিক/কর্মচারী দুর্বলতা, দুর্ঘটনা প্রভৃতি কারণে অসুস্থ বা প্রসূতি শ্রমিক/কর্মচারী চিকিৎসার সুযোগসুবিধা ভোগ করে। বিনা ব্যয়ে ডাক্তার ও ঔষধের সুবিধা পেয়ে থাকে। শ্রমিক/কর্মচারী, কর্পোরেশন পরিচালিত হাসপাতালে ভর্তির সুযোগ পায়, প্রয়োজনে ডাক্তার রোগীর বাড়িতে গিয়ে চিকিৎসা করে আসে। যে সমস্ত বীমাকারী শ্রমিক/কর্মচারী যক্ষা, ক্যানসার, কুষ্ঠ, মানসিক ভারসাম্যহীনতায় ভুগছে তাদের অতিরিক্ত চিকিৎসার সুবিধা দেওয়ার নীতি কর্পোরেশন সম্প্রতি গ্রহণ করেছে। এছাড়া কৃত্রিম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, দাঁত প্রভৃতির জন্যও সুবিধা দেওয়া হয় এই নীতি অনুসারে। বীমাকারী শ্রমিকদের সর্বাধুনিক চিকিৎসার সুযোগ দেওয়ার জন্য কর্পোরেশন দেশের সর্বাধুনিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কিডনি পরিবর্তন, ক্যানসারের উন্নততর চিকিৎসা, হার্টের অপারেশন প্রভৃতির ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। এই খাতে প্রতি ক্ষেত্রে অর্থ সাহায্যের পরিমাণ 25 হাজার টাকা থেকে সাত লক্ষ টাকা পর্যন্ত। বীমাকারী শ্রমিকের উপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যরাও চিকিৎসার সমস্ত সুবিধাই পেয়ে থাকে।

(গ) **প্রসূতিকালীন সাহায্য (Maternity Benefit) ঃ** এই আইনে মহিলা শ্রমিকদের প্রসূতি অবস্থায় অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা আছে। মহিলা শ্রমিকদের সন্তান প্রসবের 6 সপ্তাহ আগে ও 6 সপ্তাহ পরে মোট 12 সপ্তাহ সম্পূর্ণ গড় মজুরির হারে অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা আছে।

(ঘ) **অক্ষমতাকালীন সাহায্য (Disablement Benefit) ঃ** কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনার ফলে কোনো বীমাকারী শ্রমিক সাময়িক বা সম্পূর্ণ অক্ষম হয়ে পড়লে অর্থ সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এই অবস্থায় শ্রমিক বিনা ব্যয়ে চিকিৎসার সুযোগ তো পায়ই, এছাড়া আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ অক্ষমতার মাত্রার উপর নির্ভর করে। সাময়িক অক্ষম অবস্থায় মজুরির 70 শতাংশ ঐ সময়ে অর্থ সাহায্য হিসাবে দেওয়া হয়। অক্ষমতা যদি স্থায়ী ও আজীবন হয় তাহলে মজুরির 70 শতাংশ মাসিক পেনসন হিসাবে সারাজীবন দেওয়া হয়।

(ঙ) **পোষ্যদের সাহায্য (Dependent's Benefits) ঃ** কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনার ফলে কোনো বীমাকারী শ্রমিকের মৃত্যু হলে তার পোষ্যদের অর্থ সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। অর্থ সাহায্যের পরিমাণ নির্ভর করে মৃত শ্রমিকদের সঙ্গে পোষ্যদের সম্পর্কের উপর। যেমন মৃত শ্রমিকের বিধবা স্ত্রী সম্পূর্ণ বেতনের তিন পঞ্চমাংশ ($\frac{3}{5}$ অংশ) হারে সারাজীবন অথবা যতদিন পর্যন্ত না পুনর্বিবাহ করে ততদিন পর্যন্ত অর্থ সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। প্রতিটি নির্ভরশীল পুত্র (Dependent son) সম্পূর্ণ বেতনের দুই পঞ্চমাংশ ($\frac{2}{5}$ অংশ হারে) যতদিন পর্যন্ত না 15 বৎসর বয়সে পৌঁছায় ততদিন অর্থ সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা আছে এবং প্রতিটি নির্ভরশীল কন্যাও দুই পঞ্চমাংশ হারে যতদিন পর্যন্ত না 15 বৎসর বয়স বা বিবাহ এই দুটির যেটি আগে ঘটবে সেই স্তরে পৌঁছায় ততদিন অর্থ সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। তবে নির্ভরশীল পুত্র ও কন্যার অর্থ সাহায্য 15 বৎসর বয়সের পরেও চলতে পারে, যদি পুত্র ও কন্যার শিক্ষাক্ষেত্রে সন্তোষজনক অগ্রগতি দেখা যায়।

(২) কর্মচারী প্রভিডেন্ট ফান্ড আইন 1952 (Employees' Provident Fund Scheme : 1952)

1952 সালে প্রবর্তিত কর্মচারী প্রভিডেন্ট ফান্ড আইন সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত। আইনটি বাধ্যতামূলক। যে সমস্ত কারখানায় শ্রমিক সংখ্যা 20 বা তার বেশি সেক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য। আইনটি প্রবর্তিত হওয়ার সময় বলা হয় এই আইন, সিমেন্ট, সিগারেট, লৌহ ও ইস্পাত, কাগজ, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বস্ত্র এই 6টি শিল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই আইন অনুসারে শ্রমিককে মূল বেতনের $6\frac{1}{4}$ শতাংশ হারে প্রভিডেন্ট ফান্ডে বাধ্যতামূলক হিসাবে চাঁদা দিতে হয় তবে শ্রমিক ইচ্ছা করলে $8\frac{1}{3}$ শতাংশ হারে চাঁদা দিতে পারে। মালিককেও একই হারে চাঁদা দিতে হয়। বর্তমানে এই আইন 180টি শিল্পে সম্প্রসারিত করে যে সমস্ত কারখানায় শ্রমিক সংখ্যা 20 বা তার বেশি সেগুলির সমস্ততেই এই আইন প্রযোজ্য করা হয়। 1989 সালের জুন মাস থেকে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা 98টি শিল্প/প্রতিষ্ঠান যেখানে 50 জন বা তার বেশি শ্রমিক নিযুক্ত সেই সমস্ত সংস্থায় চাঁদার হার $8\frac{1}{3}$ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে 10 শতাংশ করা হয় এবং সর্বোচ্চ হার

Scanned with CamScanner

10 শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে 12 শতাংশ করা হয়। বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকেও এই আইনের আওতায় আনা হয়েছে।

(৩) **মৃত্যুত্রাণ তহবিল (Death Relief Fund) ঃ** 1964 সালে শ্রমিকদের জন্য একটি মৃত্যুত্রাণ তহবিল গঠন করা হয়। যে সমস্ত শ্রমিকের মাসিক বেতন 1000 টাকার কম, কর্মে নিযুক্ত থাকাকালীন অবস্থায় ঐ সমস্ত শ্রমিকের মৃত্যু হলে তার উত্তরাধিকারীকে মৃত্যুত্রাণ তহবিল থেকে কমপক্ষে 1250 টাকার সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। এছাড়া মৃত শ্রমিকের বিধবা স্ত্রীকে মাসিক 25 টাকা হিসাবে এবং তার পুত্রকন্যাদেরও একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট হারে পেনশন দেওয়ার ব্যবস্থা হয়।

(৪) **পারিবারিক পেনশন প্রকল্প 1971 (Family Pension Scheme, 1971) ঃ** ভারত সরকার 1971 সালে দুটি পেনশন প্রকল্প চালু করে। একটি হল খনি শ্রমিক পারিবারিক পেনশন প্রকল্প এবং অপরটি হল কর্মচারী পারিবারিক পেনশন প্রকল্প। এই পেনশন প্রকল্প দুটির মুখ্য উদ্দেশ্য হল শ্রমিকের অকাল মৃত্যু হলে মৃত শ্রমিকের পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। 1995 সালে কর্মচারী পেনশন প্রকল্প চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 1971 সালে পেনশন প্রকল্প বন্ধ হয়ে যায়।

(৫) **গ্র্যাচুইটি প্রদান আইন 1972 (Payment of Gratuity Act 1972) ঃ** 1972 সালে ভারত সরকার গ্র্যাচুইটি প্রদান আইন পাস করে। এই আইন অনুসারে কারখানা, কোম্পানি, দোকান, অফিস, রেল, খনি, তৈল ও বাগিচা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যেখানে 10 বা তার অধিক ব্যক্তি নিযুক্ত সেখানে যে শ্রমিক/কর্মচারীর 5 বৎসর চাকরি পূর্ণ হয়েছে সেই ব্যক্তি বার্ষিক 15 দিনের মজুরির হারে সর্বোচ্চ 3·5 লক্ষ (1997 সাল থেকে) টাকা গ্র্যাচুইটি হিসাবে পাবে।

(৬) **কর্মচারী পেনশন প্রকল্প 1995 (Employees's Pension Scheme 1995) ঃ** 1995 সালে প্রভিডেন্ট ফান্ড আইন সংশোধন করে কর্মচারী পেনশন প্রকল্প চালু করা হয়। পারিবারিক পেনশন প্রকল্প (1971)-এর অধীন সমস্ত শ্রমিক-কর্মচারীর ক্ষেত্রে এই প্রকল্প বাধ্যতামূলক। ন্যূনতম 10 বৎসর কর্মে নিযুক্ত থাকলে তবেই সেই ব্যক্তি এই পেনশন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। অবসর, স্থায়ী অকর্মণ্যতা, মৃত্যু ইত্যাদি ক্ষেত্রে পেনশন প্রদানের ব্যবস্থা আছে এই প্রকল্পে। পেনশনের পরিমাণ নির্ভর করে ব্যক্তির বেতন, ব্যক্তির কর্মরত সময়ের মেয়াদ ইত্যাদির উপর।

(৭) **কারখানা (সংশোধনী) বিল 2005 [The Factories (Amendment) Bill 2005]**

2005 সালের নভেম্বর মাসে কারখানা (সংশোধনী) বিলে প্রস্তাব করা হয় কার্যরত মহিলাদের নিরাপত্তা প্রদান ও শ্রম আইন সংশোধনের উদ্দেশ্যে।

ভারত সরকার নানাধরনের সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে শ্রমিক-কর্মচারীদের নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা প্রদানের চেষ্টা করেছে এবং এই ব্যাপারে বলিষ্ঠ ও যুগান্তকারী কিছু পদক্ষেপ গ্রহণও করেছে। কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। তাই বলা যায় A case of little done and vast undone অর্থাৎ যা করা হয়েছে তা অতি সামান্য এবং যা করা হয়নি তার পরিমাণ বিরাট। **প্রকৃতপক্ষে ভারতের সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাগুলি যথেষ্ট নয় তার কারণ হল ঃ**

(১) ভারতে প্রবর্তিত সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাগুলি প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। ভারতের প্রায় 90 শতাংশ শ্রমিক এই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত নয়। কেবলমাত্র সংগঠিত শিল্পের শ্রমিকরাই এই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। ভারতে শ্রমিকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দরিদ্র ও শোষিত শ্রমিক হল অসংগঠিত শিল্পশ্রমিক ও কৃষিশ্রমিক। কিন্তু দুঃখের বিষয় অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক ও কৃষিক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা ভারতে প্রায় অনুপস্থিত।

(২) সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থায় সমস্ত রকমের ঝুঁকি দূর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। যেমন ভারতে বিপুল সংখ্যক বেকার বর্তমান। ফলে সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের ব্যক্তিদের কোনো অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নেই। দেশে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অনুপস্থিতিতে সামাজিক নিরাপত্তা অর্থহীন হয়ে পড়ে।

(৩) ভারতের সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থায় যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা বা সাহায্যের কথা বলা হয়েছে তাও নগণ্য। অর্থাৎ সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাদির ব্যাপ্তি খুবই সংকীর্ণ। যেমন কর্মচারী রাজ্য বীমা প্রকল্পে (ESI) যে সমস্ত হাসপাতাল বা চিকিৎসাকেন্দ্র আছে সেগুলির শয্যাসংখ্যা, ঔষধপত্র, চিকিৎসক ইত্যাদির ব্যবস্থা যথেষ্ট কম। এই সমস্ত হাসপাতাল ও চিকিৎসাকেন্দ্র থেকে শ্রমিক-কর্মচারীরা বিশেষ সুবিধা পায় না বলে অভিযোগও করা হয়।

Scanned with CamScanner

(৪) ভারতে প্রবর্তিত সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাগুলি সঠিকভাবে রূপায়িত করতে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। এই ব্যয়ভার বহন সরকারি সংস্থার পক্ষে সম্ভব হলেও বেসরকারি সংস্থার কাছে এটি বোঝা বলেই গণ্য হয়। তাই বেসরকারি সংস্থাগুলি আইনের ফাঁক দিয়ে সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাগুলি এড়িয়ে যায়।

(৫) ভারতে যে সমস্ত সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা আছে সেগুলির মধ্যে আবার কয়েকটি ব্যবস্থা একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী। যেমন একই ধরনের সুযোগসুবিধার জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকল্প এবং ভিন্ন ভিন্ন সংস্থা আছে। এর ফলে অর্থ ও সামর্থ্যের অপচয় হয়। সেইজন্য বলা হয় ভারতে সুসংহত সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার অভাব আছে। কারণ ভারতে সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাগুলি কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়াই প্রবর্তিত হয়েছে।

(৬) ভারতে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার সুযোগসুবিধা দেওয়া হয় সেগুলি কিন্তু দুর্নীতিমুক্ত নয়। এ ছাড়া সরকারের শৈথিল্য ও দীর্ঘসূত্রিতা সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা রূপায়ণে বাধা সৃষ্টি করে।

উপসংহারে বলা যায়, 1990-এর দশকে ভারতে প্রবর্তিত নয়া আর্থিক নীতির অঙ্গ হিসাবে 1991 সালের শিল্পনীতিতে বেসরকারিকরণের উপর গুরুত্ব প্রদান করেছে। এই নীতির প্রয়োগের ক্ষেত্রে দেখা যায় ভারত সরকার সরকারি উদ্যোগে পরিচালিত রুগ্‌ণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিদায় নীতি অনুসরণ করে স্বেচ্ছামূলক অবসর প্রকল্প/বাধ্যতামূলক অবসর প্রকল্প প্রবর্তন করেছে। এছাড়া সরকারি ক্ষেত্রের বিলগ্নিকরণের ফলে বেসরকারি মালিকরা প্রতিষ্ঠানটির মালিকানা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উদ্বৃত্ত শ্রমিক-কর্মচারী হ্রাসের উপর জোর দিচ্ছে। ফলে বিলগ্নিকৃত প্রতিষ্ঠানেও স্বেচ্ছামূলক অবসর প্রকল্প চালু হয়েছে। এই সমস্ত কারণে ভারতে শিল্পক্ষেত্রে কর্মচ্যুতির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। এই বিষয়ে সমস্যা সমাধানের জন্য ভারত সরকার 1992 সালে জাতীয় পুনর্নবীকরণ তহবিল (National Renewal of Fund) গঠন করেছে। এই তহবিল গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য হল শিল্প ক্ষেত্রে বিদায় নীতি অনুসরণ করার ফলে যারা কাজের সুযোগ হারাবে তাদের পুনর্বাসনের জন্য অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা করা। কিন্তু জাতীয় পুনর্নবীকরণ তহবিলের প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব এবং ভারতের সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততা ও কম ব্যাপ্তির জন্য বর্তমানে ভারতে প্রবর্তিত বিদায় নীতি সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থায় জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। এই জটিল পরিস্থিতিতে সমগ্র দেশের উপযোগী ব্যাপক সুসংহত ও বহুমুখী সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা জরুরি হয়ে পড়েছে।

● **১২.২.৫. ভারতের মহিলা শ্রমিক ও শিশুশ্রমিক (Women and Child Labour in India) ঃ** বর্তমানে ভারতে মহিলা শ্রমিক ও শিশু শ্রমিকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতে শিশু শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণের ধারণাও অতি সাম্প্রতিক কালের। ভারতের মহিলা ও শিশু শ্রমিকের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হল ঃ

(ক) **ভারতের মহিলা শ্রমিক (Women Labour in India) ঃ** যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মহিলারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে মহিলাদের ভূমিকা সম্পর্কে 1970-এর দশকের আগে কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। 1970-এর দশক থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মহিলাদের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা চলতে থাকে। 1991 সালে বিশ্বব্যাঙ্ক কর্তৃক Gender and Poverty in India নামক প্রতিবেদনে দারিদ্র্য দূরীকরণে মহিলাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। প্রকৃত অর্থে অর্থনৈতিক উন্নয়নে শুধু যে পুরুষ শ্রমিক অংশগ্রহণ করে তাই নয়, মহিলা শ্রমিকদের অবদানও যথেষ্ট। এছাড়া মহিলারা শ্রমিক না হয়েও পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করে।

অভাব অনটনে জর্জরিত ভারতের মহিলা শ্রমিক মাসিক সামান্য মজুরিতে বিভিন্ন বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করে। হাসপাতাল, নার্সিংহোম প্রভৃতি ক্ষেত্রেও মহিলা শ্রমিকদের চাহিদা আছে। মহিলা-প্রধান পেশাগুলি সাধারণভাবে শ্রম প্রগাঢ় এবং মজুরিও কম। বাস্তবে দেখা যায় বহু মহিলা বিবাহিত বা অবিবাহিত বা বিবাহ বিচ্ছিন্না যাই হোক না কেন, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে অর্থ উপার্জন ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পেতে ইচ্ছুক থাকে বলে মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ভারতে মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মুখ্যশ্রমিক (Main Worker) হিসাবে (যাদের সারা বৎসর কাজ থাকে) গ্রামাঞ্চলে মহিলা শ্রমিকের কাজে নিযুক্তির হার শহরাঞ্চলের তুলনায় বেশি। মহিলা কর্মীদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রগত বণ্টন থেকে পাওয়া যায় প্রায় 56·6 শতাংশ মহিলা কর্মী সামাজিক ও

Scanned with CamScanner

ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে নিযুক্ত, যন্ত্রশিল্পে নিযুক্ত 20·3 শতাংশ, কৃষিকাজ ও তৎসংলগ্ন ক্ষেত্রে 9·4 শতাংশ, অর্থ, বীমা, গৃহনির্মাণ এবং ব্যবসায় নিযুক্ত 5·5 শতাংশ।

ভারতের মোট কৃষি শ্রমিকের প্রায় 46 শতাংশ হল মহিলা শ্রমিক। কৃষিক্ষেত্রে শ্রমশক্তির যোগানে মহিলা শ্রমিকদের গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সেই সঙ্গে মহিলা কৃষি শ্রমিকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারতে মহিলা কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হল এই ধরনের শ্রমিক তুলনামূলকভাবে সস্তা অর্থাৎ মহিলা কৃষি শ্রমিকদের পুরুষ কৃষি শ্রমিকদের তুলনায় কম মজুরি দেওয়া যায়। কৃষিক্ষেত্রে মহিলা শ্রমিকদের সংগঠনের অস্তিত্ব ভারতের বেশিরভাগ রাজ্যে নেই বললেই চলে। তাই কৃষিক্ষেত্রে মহিলা শ্রমিকদের প্রতি যে অবিচার চলে তা দূর হয় না। প্রকৃতপক্ষে কৃষিশ্রমিক পরিবারের আর্থিক সমস্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় পুরুষ শ্রমিক যেমন কাজের আশায় অসংগঠিত ক্ষেত্রে হাজির হয় ঠিক একইভাবে মহিলারাও গৃহকাজ ছাড়াও কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে নিজেদের আরও যুক্ত করছে। তাই গ্রামাঞ্চলে মহিলা কৃষিশ্রমিকের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শহরাঞ্চলে মহিলা শ্রমিক/কর্মচারী সব থেকে বেশি নিয়োজিত হয় সংগঠিত শিল্প, ব্যাঙ্ক, প্রশাসন, বীমা, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি ক্ষেত্রে। শিক্ষিত মহিলাদের একটি অংশ স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত। শহরাঞ্চলে মহিলা শ্রমিকরা নিজেদের অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে গ্রামাঞ্চলের মহিলা শ্রমিকদের তুলনায় বেশি সচেতন। বর্তমানে উপজীবিকায় তৃতীয় ক্ষেত্রে মহিলা শ্রমিকদের সুযোগসুবিধা ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলেই প্রশাসন, বৃত্তিমূলক কাজ, শিক্ষকতা এবং অতি সম্প্রতি তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও মহিলারা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে অধিকতর সচেতন।

কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মহিলাদের শিল্প কারিগরী প্রশিক্ষণের জন্য 800টি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। এর মধ্যে 218টি প্রতিষ্ঠান হল শুধুমাত্র মহিলাদের শিল্প কারিগরী প্রশিক্ষণের জন্য এবং বাকি 582টি প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের প্রশিক্ষণের জন্য আলাদা বিভাগ আছে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে মোট 46658টি আসন আছে মহিলাদের শিল্পকারিগরী প্রশিক্ষণের জন্য।

ভারতের মহিলা সমাজের অবস্থার উন্নয়ন ও তাদের অধিকার বজায় রাখা সম্পর্কে 1971 সালে একটি কমিটি (Committee on the Status of Women in India 1971) গঠিত হয়। এই কমিটির প্রতিবেদনে ভারতের মহিলা সমাজের অবস্থা বিশ্লেষণ করে মহিলাদের উন্নয়নের জন্য বেশকিছু সুপারিশ করা হয়। **আন্তর্জাতিক মহিলা দশকে** (1975-1985) মহিলা সমাজের বিশেষ করে মহিলা শ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য ভারতে কয়েকটি কল্যাণদায়ক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। এর মধ্যে ছিল শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, কর্মসংস্থান ইত্যাদি। 1978 সালে কেন্দ্রীয় সরকার মহিলাদের কাজে নিযুক্তি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও কর্মসংস্থান ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য একটি কার্যকরী গোষ্ঠী (Working Group) গঠন করে এবং 1985 সালে মহিলা ও শিশুদের জন্য ভারত সরকার একটি আলাদা বিভাগ চালু করে।

মহিলারা বিশেষ করে মহিলা শ্রমিকরা পুরুষদের তুলনায় শিক্ষা ক্ষেত্রে, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এবং অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে যেহেতু বিভিন্নভাবে অসুবিধা ভোগ করে সেহেতু সরকার মহিলাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী বর্তমানে গ্রহণ করেছে। যেমন 2001 সালে মহিলা সক্ষমতার জন্য জাতীয় নীতি (National Policy for Empowerment of Women) ঘোষণা করা হয় মহিলাদের সমাজে সার্বিক স্থান দিয়ে তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের উপাদান হিসাবে কাজ করার সক্ষমতা অর্জনের উদ্দেশ্যে। দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (2002-2007) মহিলাদের সক্ষমতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে মহিলাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য। মহিলা সক্ষমতার উপর জাতীয় নীতি কার্যকর করার উদ্দেশ্যে মহিলা সক্ষমতা জাতীয় কার্যকর নীতি (National Plan of Action for Empowerment of Women) চালু করা হয়। সামাজিক সক্ষমতা, অর্থনৈতিক সক্ষমতা এবং লিঙ্গগত সাম্যসহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।

মহিলাদের সক্ষমতার উপর প্রভাব ফেলার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার বেশ কয়েকটি কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ

(১) **স্বয়ংসিদ্ধা (Swayamsiddha)** ঃ স্বয়ংসিদ্ধা প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হল স্ব-সাহায্য গোষ্ঠী (Self-Help Group) তৈরি করে বিভিন্ন ধরনের কাজের মাধ্যমে মহিলাদের সাবলম্বী করে তোলা।

(২) **স্ব-শক্তি প্রকল্প (Swa-Shakti Project)** ঃ স্ব-শক্তি প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্যে হল মহিলাদের স্বনিয়োজিত কাজে অর্থসংস্থান ও অন্যান্য সাহায্য দান। বিহার, ছত্রিশগড়, গুজরাট, হরিয়ানা, ঝাড়খণ্ড, কর্ণাটক,

Scanned with CamScanner

মধ্যপ্রদেশ, উত্তরাঞ্চল এবং উত্তরপ্রদেশে এই প্রকল্পের কাজ চলছে। এই প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার 5 বৎসরের জন্য 186 কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।

(৩) **রাষ্ট্রীয় মহিলা কোষ (Rashtriya Mohila Kosh) :** মহিলাদের জন্য যে জাতীয় ঋণ তহবিল তৈরি করা হয়েছে তাকেই বলা হয় রাষ্ট্রীয় মহিলা কোষ। এর উদ্দেশ্য হল মহিলা উদ্যোক্তাদের ঋণের ব্যবস্থা করা।

(৪) **স্বধার এবং কর্মরত মহিলাদের জন্য হোস্টেল (Swadhar and Hostel for Working Women) :** কর্মরত মহিলাদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ এবং শিশুর মায়েরা কাজে গেলে শিশুদের দেখাশোনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন সমাজকল্যাণ বোর্ডকে অনুদান দিচ্ছে।

(৫) **মহিলাদের প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের জন্য প্রকল্প (Support to Training and Employment Programme for Women) :** হাতের কাজ, কৃষি, পশু প্রজনন ও রক্ষণাবেক্ষণ, তাঁত, মৎস্যচাষ, দুগ্ধ প্রকল্প প্রভৃতি কাজে মহিলাদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি প্রকল্প প্রবর্তিত হয়েছে যেটি মহিলাদের প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানে সাহায্যের জন্য প্রকল্প নামে পরিচিত। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল দরিদ্র মহিলাদের বর্তমান দিনের দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে তাদের দক্ষতা ও আয় সৃষ্টিতে সাহায্য করা।

এই সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মহিলা শ্রমিকদের অবদান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে ভারতের পুরুষ কর্মীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মহিলা কর্মীরাও বিমান চালনা থেকে শুরু করে গৃহস্থ পরিবারে আংশিক সময়ে কাজের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতের মহিলা কর্মীদের কিছু সমস্যা থেকেই গেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সমস্যা হল রাত্রিতে কাজের সমস্যা। বর্তমানে আর একটি সমস্যা মহিলা কর্মীদের ক্ষেত্রে ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। সেটি হল কর্মক্ষেত্রে যৌন নিগ্রহ (Sexual Harassment) সমস্যা। এটি সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় ছড়িয়ে পড়ছে। তবে আশার কথা মহিলা শ্রমিকদের অধিকার যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তার জন্য বিভিন্ন সংস্থা ও মহিলা সংগঠনগুলি ভারতে খুবই সক্রিয়।

(খ) **ভারতের শিশু শ্রমিক (Child Labour in India) :** শিশু শ্রমিক নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (International Labour Organisation) যখন প্রথম অধিবেশন আহ্বান করে ভারত তাতে সম্মতি প্রদান করে। তার পর থেকে ভারতের শিশু শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার কিছু আইন পাস হয়। ভারতীয় সংবিধানে 24 ধারায় বলা হয় 14 বৎসরের কম কোনো শিশুকে কারখানা, খনি বা অন্যত্র কষ্টকর কাজে নিয়োগ করা যাবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতে শিশু শ্রমিকের সমস্যা খুবই গভীরে। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় শ্রমিকদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হল শিশু শ্রমিক। এশিয়া মহাদেশে মোট যে শিশু শ্রমিক আছে তার এক-তৃতীয়াংশ আছে ভারতে।

ভারতের শিশু শ্রমিকের সংখ্যা সম্পর্কে যথেষ্ট মতভেদ আছে। 1981 সালের আদমশুমারী অনুসারে ভারতে মুখ্য শিশু শ্রমিকের (Main Workers) (যাদের সারা বৎসর কাজ থাকে) সংখ্যা হল 11·2 মিলিয়ন এবং প্রান্তিক শিশু শ্রমিকের (যাদের সারা বৎসর কাজ থাকে না) সংখ্যা হল 2·4 মিলিয়ন। 2001 সালের আদমশুমারী অনুসারে 5 থেকে 14 বৎসর বয়সের শিশু শ্রমিকের সংখ্যা 12·5 মিলিয়ন। 10 থেকে 14 বৎসরের শিশু শ্রমিকের সংখ্যা 10·7 মিলিয়ন।

সরকারি আইন থাকা সত্ত্বেও দেশলাই, কার্পেট, আতশবাজি ইত্যাদি মারাত্মক পেশায় শিশু শ্রমিকদের নিয়োগ করা হয়। নিয়োগকর্তারা নানাধরনের শিশু শ্রমিক নিয়োগ পচ্ছন্দ করে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণ হল :

(১) প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিকদের তুলনায় শিশু শ্রমিকদের কম মজুরি দিতে হয়। শিশু শ্রমিককে দিয়ে নিয়োগকর্তা মজুরির তুলনায় বেশি কাজ আদায় করে নিতে পারে।

(২) আইনগত কারণে শিশু শ্রমিকরা শ্রমিক সংঘের সদস্য হতে পারে না এবং নিজেরা সংঘবদ্ধ হয়ে শ্রমিক সংঘও গঠন করতে পারে না। শ্রমিক সংঘের চাপ না থাকায় নিয়োগকর্তা শিশু শ্রমিকদের সম্মতি আদায় করে বা প্রয়োজনে চাপ দিয়ে অতিরিক্ত কাজ আদায় করে নেয়। পূর্ণবয়স্ক শ্রমিকদের দিয়ে এটি করা সম্ভব নয়, কারণ তাদের নিজস্ব সংগঠন আছে। শুধু তাই নয় প্রয়োজনে কাজ ছেড়ে অন্য স্থানে যেতেও পারে। শিশু শ্রমিকদের পক্ষে কিন্তু কাজ ছেড়ে যাওয়ার অনেক অসুবিধা থাকায় তারা কাজ ছাড়তে সাহস পায় না।

(৩) শিশু শ্রমিকরা তুলনামূলকভাবে বাধ্য, কাজ শেখার প্রবণতা অধিক, তাই অতি সহজেই সে কাজ শিখে নিতে পারে। পূর্ণবয়স্ক শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এটি খুব কম থাকে।

এই সমস্ত কারণে ভারতে শিশু শ্রমিক নিয়োগকর্তার কাছে বেশি আকর্ষণীয়। ভারতের শিশু শ্রমিকদের যেমন চাহিদা আছে তেমনি ভারতে শিশু শ্রমিকের যোগানও বেশি। ভারতে শিশু শ্রমিকের যোগান বেশি

Scanned with CamScanner

হওয়ার প্রধান কারণ হল তাদের পিতামাতার নিদারুণ দারিদ্র্য। অনেক সময়েই দরিদ্র পিতামাতার পক্ষে শিশুর ভরণপোষণের ভার বহন সম্ভব হয় না। এছাড়া দরিদ্র পিতামাতার মধ্যে একটি স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা যায় শিশুকে বিদ্যালয়ে না পাঠিয়ে অল্পবয়সেই তাকে দিয়ে পারিবারিক আয় বৃদ্ধির চেষ্টা। ভারতে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধির মূল কারণ দারিদ্র্য হলেও এর সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য কারণগুলি হল জনসাধারণের নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, বাধ্যতামূলক শিশু শিক্ষার অনুপস্থিতি ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে ভারতে বাধ্যতামূলক শিক্ষার আইন কাগজে কলমে থেকে গেছে। ফলে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের শিশুরা বিদ্যালয়ে না গিয়ে গৃহপালিত পশু, গরু, ছাগল, মহিষ প্রভৃতির পরিচর্যা করে অথবা জ্বালানি সংগ্রহ করে বা মাঠে পূর্ণবয়স্কদের সঙ্গে চাষের কাজ করে। এই ধরনের কাজের মূল কারণ কিন্তু দারিদ্র্য। দারিদ্র্যই গ্রামাঞ্চলের শিশুকে এই ধরনের কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। শুধু গ্রামাঞ্চলই নয় আধা শহর ও শহরাঞ্চলেও শিশু শ্রমিকরা চা, রেস্টুরেন্ট বা গৃহস্থালির কাজে মূলত নিযুক্ত হয়। এছাড়া কিছু কিছু শিশু রাস্তার মধ্যেই বসবাস করে। এরা শহরের ফুটপাতে, রেলওয়ে স্টেশনে, পার্কে দিন কাটায় এবং অসংগঠিত কাজে যুক্ত থাকে। এদের অনেকে স্থানীয় মস্তানদের ছত্রছায়ার থেকে কাজের ব্যবস্থা করে। পরিণামে এই সমস্ত শিশু শ্রমিক বড় হয়ে অনেক সময় অসামাজিক কাজে যুক্ত হয়ে পড়ে। এছাড়াও অনেক শিশু শ্রমিক আবার ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে যুক্ত থাকে। এরা চুড়ি, কার্পেট, আতশবাজি, বিড়ি, কাচ, টিপ তৈরি ইত্যাদি হস্তশিল্পেও নিযুক্ত হয়।

কলকারখানা, খনি বা অন্যান্য কষ্টকর কাজে শিশু শ্রমিক নিয়োগ ভারতে বে-আইনি হলেও অন্যক্ষেত্রে শিশু শ্রমিক নিয়োগ কিন্তু বে-আইনি নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল শিশু শ্রমিকের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে বিপজ্জনক পেশায় ব্যাপকহারে শিশু শ্রমিকদের নিয়োগ করা হয়। এই সমস্ত শিশু শ্রমিকদের জন্য সবথেকে উদ্বেগের বিষয় হল এদের শৈশবকে ধ্বংস করে পারিবারিক জীবন থেকে বঞ্চিত করা।

ভারতে শিশু শ্রমিকদের রক্ষা ও কাজের শর্তাবলী উন্নয়নের জন্য **ভারত সরকার বেশকিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।** যেমন ঃ

(১) 1952 সালের খনি আইনে দেশের খনিগুলিতে শিশু শ্রমিক নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়।

(২) 1986 সালের শিশু শ্রমিক (বন্ধ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন [The Child Labour, (Prohibition and Regulation) Act 1986]-এর মাধ্যমে বিপজ্জনক পেশায় শিশু শ্রমিক নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং সংগঠিত শিল্পক্ষেত্রের মধ্যে যেগুলি বিপজ্জনক নয় সেই সমস্ত ক্ষেত্রে শিশু শ্রমিকদের কাজের সময় নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।

(৩) 1987 সালে ভারত সরকার শিশু শ্রমিক সম্পর্কে একটি জাতীয় নীতি ঘোষণা করে। এই নীতির তিনটি পদ্ধতি হল ঃ (i) আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ, (ii) সাধারণ উন্নয়ন কর্মসূচী এবং (iii) প্রকল্পভিত্তিক কাজের পরিকল্পনা। এই নীতির ভিত্তিতে ভারত সরকার দুটি প্রকল্প গ্রহণ করে। একটি হল জাতীয় শিশু শ্রমিক প্রকল্প কর্মসূচী (National Child Labour Project Scheme : NCLP) এবং অপরটি হল শিশু শ্রমিক অবলুপ্তির উদ্দেশ্যে নিয়োজিত স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য অনুদান (Grant-in-aid) প্রদান প্রকল্প। বর্তমানে 100টি জাতীয় শিশু শ্রমিক প্রকল্প কর্মসূচীতে 2·11 লক্ষ শিশু শ্রমিককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে অতিরিক্ত 150টি জাতীয় শিশু শ্রমিক প্রকল্প কর্মসূচী মঞ্জুর করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল।

(৪) 1992 সালে শিশু শ্রমিক বন্ধ করার উদ্দেশ্যে এক আন্তর্জাতিক কর্মসূচী গৃহীত হয়। এই কর্মসূচীতে 730 কোটি টাকা ব্যয়ে 89টি প্রকল্প রূপায়িত হয়।

(৫) 1994 সালের স্বাধীনতা দিবসে প্রধানমন্ত্রী বিপজ্জনক পেশায় 2000 সালের মধ্যে শিশু শ্রমিক নিয়োগ বন্ধের উদ্দেশ্যে নয়া কর্মসূচী ঘোষণা করেন।

(৬) সম্প্রতি সারা দেশে সর্বশিক্ষা অভিযান চালু করে এবং এই প্রকল্পে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে মধ্যাহ্ন ভোজনের (Mid Day Meal) ব্যবস্থা করে শিশুরা যাতে বিদ্যালয়ে যেতে উৎসাহী হয় তার জন্য ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

(৭) 2008 সালের মার্চ মাসে **ধনলক্ষ্মী** (Dhanlakshmi) নামে একটি পাইলট প্রকল্প চালু করা হয়। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল শিশু-কন্যার পরিবারগুলিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে শিশু কন্যার জন্ম নথিভুক্তকরণ, রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Immunization) এবং অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয়ে নথিভুক্তকরণের ব্যবস্থা করা। এই প্রকল্প 7টি রাজ্যের 11টি ব্লকে প্রবর্তন করা হয়। 2009-10 সালে 5·00 কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে 42,077 জন শিশু-কন্যাকে সুবিধা দেওয়ার জন্য। 2010-11 সালে 10,384টি পরিবারকে সুবিধা দেওয়া হয়েছে 2010 সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত।

Scanned with CamScanner

(৮) 2009-10 সালে সম্পূর্ণ শিশু সুরক্ষিত প্রকল্প (Integrated Child Protection Scheme : ICPS) চালু করা হয়। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল দেশের যে সমস্ত শিশুর যত্ন এবং সুরক্ষার প্রয়োজন আছে এবং আইন সংক্রান্ত কারণে যে সমস্ত শিশু অসুবিধায় আছে সেই সমস্ত শিশুর সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের জন্য নিরাপদ ও যথাযথ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এই প্রকল্পটি বর্তমানে রাজ্য সরকারগুলি বাস্তবায়িত করছে। একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাই (2007-2012) এই প্রকল্পে 1,073 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। 2009-10 সালে 121টি ক্ষেত্রে এই প্রকল্পের মাধ্যমে অর্থসংস্থান করা হয়েছে 12,100 জন শিশুকে সাহায্য প্রদানের উদ্দেশ্যে। 2010-11 সালে এই প্রকল্পের জন্য 300 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং 2011 সালে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত 82·37 কোটি টাকা বণ্টন করা হয়েছে।

সরকার ছাড়াও স্বেচ্ছামূলক সংগঠনগুলি শিশু শ্রমিক নিয়োগ বন্ধের উদ্দেশ্যে কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। যেমন CREDA নামে একটি সংগঠন উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুরে কার্পেট শিল্পে শিশু শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে 10টি বিদ্যালয় স্থাপন করে। কার্পেট শিল্প থেকে উদ্ধার করা শিশু শ্রমিকদের এই সমস্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান সহ খাদ্য বণ্টনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। শুধু শিক্ষা বা খাদ্যই নয় এই সমস্ত শিশুকে মাসিক 100 টাকা করে পারিশ্রমিক দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। এছাড়া এই সংস্থা শিশুদের হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

প্রকৃতপক্ষে ভারত সরকার শিশু শ্রমিক নিয়োগ নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন প্রণয়ন করলেও শিশু শ্রমিক নির্মূল করার জন্য ভারত সরকার কিন্তু কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। কারণ শিশু শ্রমিকের সমস্যা মূলত অর্থনৈতিক সমস্যা। এই সমস্যা সৃষ্টির প্রধান কারণ হল সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য। তাই আইন করে শিশু শ্রমিক নির্মূল করা সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে দারিদ্র্য দূর না হলে শিশু শ্রমিক নির্মূল করা সম্ভব নয়। তাই এই সমস্যা সমাধানের জন্য একদিকে যেমন দারিদ্র্যের সমস্যা সমাধান করা প্রয়োজন তেমনি অপরদিকে প্রয়োজন হল শিশুরা যাতে বিদ্যালয়ে যায় তার ব্যবস্থা করা। দারিদ্র্য দূরীকরণ যেহেতু দীর্ঘকালীন অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যম ছাড়া সম্ভব নয় তাই বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে যে সমস্ত শিশু বিদ্যালয়ে আসবে তাদের মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন সহ শিশুকে মাসিক বৃত্তি বা ভাতা হিসাবে কিছু অর্থ দিয়ে দরিদ্র পিতামাতার তার শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠানোর আগ্রহ সৃষ্টি করা যেতে পারে। কারণ এর ফলে দরিদ্র পিতামাতার একবেলার জন্য শিশুর খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে না এবং শিশু বিদ্যালয়ে যাওয়ার ফলে যে আর্থিক ক্ষতি হয় তার কিছুটা এই বৃত্তি বা ভাতার মাধ্যমে পূরণ হয়। শুধু অর্থনৈতিক সমস্যাই নয় শিশু শ্রমিকের কিছু সামাজিক সমস্যাও আছে। এই সামাজিক সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য শিশু শ্রমিকের পিতামাতাকে বোঝাতে হবে তার শিশুর বিদ্যালয়ে যাবার প্রয়োজনীয়তা। শিক্ষার মাধ্যমেই আজকের শিশু ভবিষ্যতে একজন সৎ, দক্ষ এবং আর্থিক দিক দিয়ে সচ্ছল ব্যক্তিতে পরিণত হতে পারে এটি যতদিন পর্যন্ত না শিশু শ্রমিকের পিতামাতা উপলব্ধি করতে পারে ততদিনে ভারতের শিশু শ্রমিকের সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। শিশু শ্রমিকের পিতামাতার এই উপলব্ধি না হওয়ার জন্যই পশ্চিমবঙ্গে বিনা বেতনে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও নিরক্ষর শিশু শ্রমিকের সংখ্যা কিন্তু এ রাজ্যে খুব কম নয়। তাই প্রয়োজন হল সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলির যৌথভাবে শিশু শ্রমিকের সমস্যা সমাধানে আরও বেশি উদ্যোগী ও তৎপর হওয়া। প্রকৃত অর্থে দেশের শিশুই হল দেশের ভবিষ্যৎ সম্পদ। সুতরাং শিশুকে অবহেলা করা অপরাধ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই শৈশবেই এদের শ্রমিক হিসাবে গড়ে তুলে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ অপহরণ কোনো মতেই কাম্য নয়।

● **১২.২.৬ ভারত সরকারের বিদায় নীতি (Exit Policy of the Government of India) ঃ** 1991 সালে ভারত সরকার ভারতীয় অর্থনীতিতে কাঠামোগত সংস্কারের যে দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাকেই বলা হয় নতুন অর্থনৈতিক নীতি। এই নতুন অর্থনৈতিক নীতির মূল লক্ষ্য হল ভারতে কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পিত অর্থনীতিকে বাজারমুখী অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করা। নতুন অর্থনৈতিক নীতির অ। হিসাবে 1991 সালে ভারত সরকারের শিল্পনীতি ঘোষিত হয়। এই শিল্পনীতিতে বেসরকারিকরণের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। ভারতে যে অর্থনৈতিক সংস্কার চলছে তার প্রধান বিষয় হল কাঠামোগত সামঞ্জস্য সাধন (Structural Adjustment) কর্মসূচী। এই কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে যে সমস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে লাভজনক সংস্থায় পরিণত করা সম্ভব নয় সেগুলি বন্ধ করার নীতি ঘোষণা করা হয়। এর ফলে যে সমস্ত শ্রমিক-কর্মচারী কাজ হারাবে তাদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে (Golden Handsake) বিদায়ের সঙ্গেই বাধ্যতামূলকভাবে অবসর দিতে হবে। এটিই হল শিল্প ক্ষেত্রে বিদায় নীতি।

Scanned with CamScanner

1991 সালে ভারত সরকারের শিল্পনীতির আর একটি বিশেষ দিক হল সরকারি ক্ষেত্রের বেসরকারিকরণ। ভারতের সরকারি ক্ষেত্রের বেসরকারিকরণের প্রধান উদ্দেশ্য হল সরকারি শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির ভর্তুকি তুলে দিয়ে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বৃদ্ধি করা। সরকারি ক্ষেত্রের বেসরকারিকরণ তথা বিলগ্নিকরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি বিষয় হল ঐ প্রতিষ্ঠানের কর্মসংস্থান সংক্রান্ত সমস্যা। কারণ সরকারি প্রতিষ্ঠান বিলগ্নিকরণের ফলে বেসরকারি মালিকরা সংস্থাটির মালিকানা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুৎপাদনশীল ব্যয় হ্রাস ও উদ্বৃত্ত শ্রমিক কর্মচারীর সংখ্যা হ্রাসের উপর জোর দেয়। এই জন্যই বিলগ্নিকৃত সংস্থায় স্বেচ্ছামূলক অবসর প্রকল্প (Voluntary Retirement Scheme : VRS) চালু হয়। সম্প্রতি National Institute of Public Finance and Policy পরিচালিত একটি সমীক্ষায় প্রকাশ করা হয়েছে বিলগ্নিকরণ নীতির ফলে ভারতে বর্তমানে প্রতি বৎসর 10 লক্ষ ব্যক্তি কাজের সুযোগ হারাচ্ছে।

1991 সালে ভারতে বিদায় নীতি যখন প্রথম চালু হয় তখন যুক্তি ছিল দ্রুত শিল্প উন্নয়নের জন্য শ্রমের বাজার নমনীয় (Flexible) হওয়া প্রয়োজন। শ্রমের বাজারে নমনীয়তা বলতে শ্রমিক-কর্মচারীদের একটি উৎপাদন প্রতিষ্ঠান থেকে অপর উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে বদলি, প্রয়োজনের অতিরিক্ত শ্রমিক ছাঁটাই করার স্বাধীনতাকে বোঝানো হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে বিদেশি বিনিয়োগ ও সহযোগিতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ভারতীয় অর্থনীতিকে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে ভারতের রপ্তানিজাত দ্রব্যের বিদেশের বাজারে প্রতিযোগিতামূলক দক্ষতা বৃদ্ধি ও দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে প্রতিযোগিতার পরিবেশ গড়ে তোলার যুক্তিতে। এর প্রভাবে 1991 সালের পর বিগত বৎসরগুলিতে বিদেশি সহযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উল্লেখযোগ্য ভারতীয় কোম্পানিগুলিতে বহুজাতিক সংস্থা (Multinational Corporation : MNC) ক্রমশ আধিপত্য স্থাপন করেছে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ঘটিয়ে শ্রমের পরিবর্তে যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন চালাচ্ছে ফলে বহু শ্রমিক কর্মসংস্থানের সুযোগ হারাচ্ছে। আবার ভারতীয় কোম্পানিগুলি বহুজাতিক সংস্থার (MNC) সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার উদ্দেশ্যে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যন্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি করছে। এর ফলে ভারতীয় কোম্পানিগুলিতেও শ্রমিক কাজের সুযোগ হারাচ্ছে। এই অবস্থা যে শুধু অলাভজনক সংস্থাগুলিতেই দেখা দিয়েছে তাই নয় লাভজনক সংস্থাগুলিতেও এর প্রভাব পড়েছে। কারণ লাভজনক সংস্থাগুলি তাদের লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে চাইছে শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাসের মাধ্যমে। তাই দেখা যাচ্ছে সরকারি-বেসরকারি, লাভজনক-অলাভজনক প্রায় সমস্ত ধরনের প্রতিষ্ঠানেই স্বেচ্ছা অবসর প্রকল্প (VRS)/বাধ্যতামূলক অবসর প্রকল্প (CRS) চালু করে বিদায় নীতি কার্যকর করছে। এর প্রভাবে ব্যাপক সংখ্যক শ্রমিক-কর্মচারীকে কাজ থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে।

বিদায় নীতির অনুসরণে স্বেচ্ছা অবসর প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই 1991 সালের পর থেকে ব্যাপক হারে শ্রমিক ছাঁটাই হতে দেখা যায়। সরকারি হিসাব অনুসারে 1990-এর দশকে ভারতীয় কোম্পানিগুলি যৌথভাবে প্রায় 8,70,000 জন কর্মীকে ছাঁটাই করেছে। গত কয়েক বৎসরে কর্পোরেট ক্ষেত্রে শ্রমসঞ্চয়ী পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য মাত্রায় গ্রহণ করেছে।

সরকারি ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠানগুলিতেও স্বেচ্ছা-অবসর প্রকল্পের মাধ্যমে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের সংখ্যা কম নয়। সরকারি ক্ষেত্রের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (Steel Authority of India : SAIL), কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড (C.I.L), ভারত হেভি ইলেকট্রিকালস লিমিটেড (Bharat Heavy Electricals Ltd : BHEL), হিন্দুস্থান জিঙ্ক লিমিটেড (Hindustan Zinc Limited : HZL) এবং অয়েল অ্যান্ড নেচারাল গ্যাস কর্পোরেশন (Oil and Natural Gas Corporation : ONGC) যৌথভাবে 1998-99 সাল থেকে 2000-2001 সাল পর্যন্ত 1,20,000 জন কর্মীকে ছাঁটাই করেছে। সরকারি ক্ষেত্রের ব্যাঙ্কগুলি (ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ক ইত্যাদি) যৌথভাবে স্বেচ্ছা-অবসর প্রকল্পের মাধ্যমে এক লক্ষেরও বেশি কর্মীকে ছাঁটাই করেছে।

বিদায় নীতির মাধ্যমে ব্যাপক হারে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের সমস্যার মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার 1992 সালে **জাতীয় পুনর্নবীকরণ তহবিল (National Renewal Fund)** গঠন করেন। এই তহবিল গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য হল : (১) শিল্প পুনর্গঠন ও আধুনিকীকরণের ফলে স্বেচ্ছামূলক অবসর প্রকল্পের (VRS) মাধ্যমে যে সমস্ত শ্রমিক ছাঁটাই হবে তাদের প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের ব্যাপারে সাহায্য করা, (২) ছাঁটাই শ্রমিকদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে অর্থ সাহায্য, (৩) ছাঁটাই শ্রমিকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য অর্থ সাহায্যের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা করা। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য জাতীয় পুনর্নবীকরণ তহবিলের তিনটি ভাগ আছে।

Scanned with CamScanner

(ক) নিয়োগ সৃষ্টি তহবিল (Employment Generation Fund : EGF) ঃ এই তহবিল থেকে সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

(খ) জাতীয় স্বেচ্ছা-অবসর সহায়তা তহবিল (National Renewal Grant Fund : NRGF) ঃ এই তহবিল থেকে স্বেচ্ছা-অবসর প্রকল্পের কর্মীদের অর্থসংস্থান এবং কারখানা বন্ধ বা পুনর্গঠনের ফলে ছাঁটাই কর্মীদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়।

(গ) কর্মচারী বীমা তহবিল (Insurance Fund for Employees : IFE) ঃ কর্মীদের ভবিষ্যতে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় এই তহবিল থেকে।

জাতীয় পুনর্নবীকরণ তহবিল গঠনের উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য 16টি রাজ্যে কর্মসংস্থান সাহায্য কেন্দ্র (Employment Assistance Centre) গঠন করা হয়। এছাড়া জাতীয় পুনর্নবীকরণ তহবিলে 2000 কোটি টাকার একটি নিরাপত্তা জাল (Security Net) সৃষ্টি করা হয়। এটির অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা করে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার/বিশ্বব্যাঙ্ক।

বিদায় নীতি সম্পর্কে বিতর্কিত বিষয় হল বিদায় নীতির প্রয়োগে ভারতের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন কী পরিমাণ সম্ভব এবং বিদায়নীতির ফলে যারা কর্মহীন হচ্ছে সরকারের দিক থেকে যে সমস্ত ব্যবস্থা ঐ কর্মহীন শ্রমিক-কর্মচারীর জন্য নেওয়া হচ্ছে তা পর্যাপ্ত কিনা। সরকারি ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিদায় নীতি প্রবর্তনে প্রতিষ্ঠানের সমস্যার সমাধান হবে কিনা সে নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। কারণ, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে অর্থের যে অপচয় হয় এবং দুর্নীতি হয় তা দূর করার জন্য এবং প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতার যাতে সদ্ব্যবহার হয় তার জন্য যা করার প্রয়োজন ছিল তা কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে সরকারি প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক উদ্বৃত্ত হয়েছে পরিচালনার দোষে। উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলিতে উৎপাদন ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শ্রমিক নিয়োগ করা হলেও সেই অনুপাতে প্রতিষ্ঠানগুলিতে মূলধন বিনিয়োগ করা হয়নি, উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের যোগান (যেমন বিদ্যুৎ) সুনিশ্চিত করা হয়নি, ক্ষেত্রবিশেষে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক খাতিরে অযোগ্য ও দুর্নীতিগ্রস্ত পরিচালকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। অথচ অলাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় প্রথম আঘাত দেওয়া হল বিদায় নীতির মাধ্যমে শ্রমিক-কর্মচারীদের উপর এবং এটি দেওয়া হল এমন একটি সময়ে যখন দেশ বেকার সমস্যায় জর্জরিত। তাছাড়া শ্রমিকদের বাধ্যতামূলক/স্বেচ্ছামূলক অবসর গ্রহণে যে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা সরকারের পক্ষ থেকে করা হয়েছে তা পর্যাপ্ত কিনা বা তা যথাসময়ে দেওয়া হবে কিনা এই নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। বিশেষ করে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দিক থেকে বিচার করলে এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

যে কোনো কল্যাণকামী রাষ্ট্রে সামাজিক নিরাপত্তার সুব্যবস্থা করার দায়িত্ব কিন্তু সরকার অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারত সরকার বিদায় নীতির প্রেক্ষাপটে সামাজিক নিরাপত্তার দায়িত্বের বিষয়টি সুকৌশলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে প্রতিযোগিতামূলক বাজারের অস্তিত্ব বজায় রাখা হয় শ্রমিক স্বার্থ বিসর্জন না দিয়েই, কারণ এই সমস্ত দেশের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেকার বীমার সুযোগসুবিধা বর্তমান আছে। ভারতে কিন্তু এই ধরনের কোনো ব্যবস্থা নেই। তাই অনেকে অভিমত প্রকাশ করে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের অনুকরণে ভারতীয় অর্থনীতির কাঠামোগত সংস্কারের পরিপ্রেক্ষিতে বিদায় নীতি আত্মঘাতেরই সমতুল্য। তাঁদের মতে বেকার সমস্যায় জর্জরিত ভারতে বিদায় নীতির পরিবর্তে সরকারের আগমন নীতি (Entry Policy) ঘোষিত হওয়া উচিত।

উপসংহারে বলা যায়, বর্তমান অবস্থায় শিল্পক্ষেত্রের দুরবস্থা দূর করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি দ্রুততর করতে অর্থনীতির অলাভজনক ও রুগ্ণ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে যেগুলির পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা একেবারেই অনুপস্থিত সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধীরে ধীরে বন্ধ করার প্রয়োজন অতি অবশ্যই আছে, কিন্তু এই ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভুল হলে ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক সংকট আরও বেশি ভয়াবহ হয়ে উঠবে।

Scanned with CamScan